শ্মশান, শ্রাদ্ধ ও বাবু প্রসঙ্গ

প্রণব সরকার

সেকালে হিন্দুরা যতটা পরকাল নিয়ে ভাবিত ছিলেন ইহকাল নিয়ে ততটা নয়। তাই পারলৌকিক ক্রিয়ার ঘটা ছিল সাংঘাতিক রকমের। বিপরীতে মুসলমান সম্প্রদায় বা খ্রিষ্টানরা ইহকালকেই বেশি গুত্ব দিতেন, ফলে তারা ইহকালের যাবতীয় কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করে রাখতে আগ্রহী ছিলেন। মধ্যযুগের সুলতান, বাদশাহ, আমীরবর্গ দরবারের ঘটনা লেখক বা ওয়াকিয়া নবিস নিযুক্ত করতেন। এরা প্রভুর জীবনের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, যুদ্ধের কাহিনীও লিখে রাখতেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত থেকে বিবরণ লিখতেন। বাদশাহরা নিজেরাও অনেক জীবনী লিখতেন। মৃত্যুর আগে বা পরে সমাধি সৌধ বানিয়ে সেখানে সমাধিলিপি খোদাই করা থাকত। খ্রিষ্টানদের সমাধিলিপি তো সর্বজনবিদিত। পরবর্তী কালে ইতিহাস রচনায় এগুলির সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুরা দাহ প্রথায় বিশ্বাসী ছিল এবং পরকাল নিয়ে এতটাই ভাবিত ছিল যে, সে রকম কোনো তথ্যাদি পাওয়া কষ্টকর ছিল। রোমিলা থাপার তাই বোধ হয় বলেছিলেন--দাহ প্রথা ইতিহাসের পক্ষে সহায়ক নয়।

হিন্দুদের কাছে যেহেতু পরকাল বিশেষ গ্রহণযোগ্য ছিল তাই পারলৌকিক আচারের ঘটা, দান ধ্যান, কাঙালী বিদায়, শ্মশান ক্ষেত্রে বা শ্মশান ঘাটের উন্নয়ন মূলক কাজ কর্মে বিত্তশালীরা মনোযোগী হয়েছিলেন। এমনকি তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতাও চলতো। কুৎসিৎ দলাদলিরও সাক্ষ্য মেলে। তাই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিচিত্র বিবরণ সেকালের সংবাদপত্রে মুদ্রিতও হয়েছিল।

আর একটা ব্যাপার বলে রাখা ভালো, সেকালে হিন্দুরা মনে করত, গৃহে মরাটা অমঙ্গলের তাই গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ছোট ছোট ঘর করা হত, সেখানে বৃদ্ধ, মুমূর্ষুদের এনে রাখা হত। *তারপর সকাল বিকাল চলত অন্তর্জলির অনুশীলন। তীব্র শীতেও বয়স্ক মানুষকে গলাপর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখা হত, দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকায় তিনি একদিন মারা যেতেন। তারপর তার দেহটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হত। কিংবা অনেক দেহ জোয়ারের তোড়ে ভেসে চলে যেত। আত্মীয় স্বজন ছাড়াও একদল লোক ছিল যারা অন্তর্জলীতে সাহায্য করত। অন্তর্জলিকরা মানুষদের নাম মাত্র মুখাগ্নি করা হত। গরীবরাও নামমাত্র মুখাগ্নি করে মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দিত। সে সময় দুটাকায় একটা মড়া পোড়ানো যেত, কিন্তু গরীবরা তা জোগাড় করতে পারত না। এছাড়া শাস্ত্রমতে দাহ না করে যেসব মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হত রাধারমণ মিত্র তাঁর একটা তালিকাও দিয়েছেন----“ (ক) মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ কিংবা দু-বছরের কম বয়সের শিশু। (খ) কুষ্ঠইত্যাদি কতকগুলি রোগগ্রস্থ লোক। (গ) আত্মহত্যাকারী। (ঘ) সর্পদংশনে মৃতব্যক্তি। (ঙ) কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় অপরাধে অপরাধী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি। (চ) বৈষ্ণব (বোষ্টম) প্রভৃতি কতকগুলি ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি (ছ) সন্ন্যাসী এবং (জ) যুগী নামধারী তাঁতি সম্প্রদায়ের লোক।” যে গঙ্গার জল ---------- *উদা. ২৪ পৌষ তারিখে কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণ গোবিন্দ সেন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।-সমাচার দর্পণ।লোকে পান করত তার দুরবস্থার বিবরণ দিয়ে ৫-৩-৩৪ তারিখে বাংলা প্রদেশের স্যানিটারি কমিশনের প্রেসিডেন্ট জন স্ট্যাচি লেখেন --- “যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধনের ইত্যাদি গৃহ কার্যের জন্য জল যোগায় সেই নদীতে প্রতিবছর ৫ হাজারের

উপর মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। মাত্র সরকারি হাসপাতাল গুলিথেকেই এক বছরে ২০০ মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হয়েছে।" এ ছাড়া জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হত। সব মিলিয়ে সে ছিল এক নারকীয় কান্ড।

এবার বাবু প্রসঙ্গ। সেকালের গঙ্গাযাত্রীদের জন্য কলকাতার বিখ্যাত শ্মশান ঘাটগুলোর পাশে গৃহ থাকত।অনেকে পুণ্যের লোভে এই রকম গৃহ নির্মাণ করে দিতেন। রানী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস নিমতলা শ্মশান ঘাটের দক্ষিণ দিকে গঙ্গা যাত্রীদের জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করে দেন। কেউ কেউ শ্মশান যাত্রীদের জন্য পাকাশ্মশানঘাট তৈরি করে দিতেন। কেউ আবার শ্মশান বা শ্মশান ঘাটের জমি দিতেন। আর নাড়াইলের জমিদার, বাবু চন্দ্রকুমার রায় ও তাঁর ভাই কাশীপুর শ্মশান ঘাটের জন্য জমিদান করেছিলেন। আর কলকাতা শহরতলির মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য এই শ্মশানঘাট ১৮৭৪ - ৭৫ সনে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। কাশী মিত্রের শ্মশানঘাট স্বয়ং কাশীর মিত্র ১৭৭৮ সালে তৈরি করে দেন। অপুত্রক, এই ধনী নিঃসন্তান ছিলেন। এই ঘাটের পূবপাশে তাঁর বিরাট বাড়ি ছিল। 'কলিকাতা দর্পণ' -এ পাই "কাশী মিত্রের শ্মশানের আয়তন গোড়ায় ছিলমাত্র নয় কাঠা। এই শ্মশান এক সময় অবস্থাপন্ন হিন্দুরা ব্যবহার করত, কিন্তু এখন গরিবেরাই বেশি ব্যবহারকরে। বিভিন্ন হাসপাতালের কাটা ছেঁড়া মড়াও এখানে আগে পোড়ানো হতো। ১৮৮২- ৮৩ সনে বাবু অক্ষয়চন্দ্র গুহ নিজ খরচে একটি গঙ্গাযাত্রীর আবাস তৈরি করে দেন।। ১৮৫৪ সনে এই কাশীমিত্রের ঘাট থেকেই ৩৯৮২ টি মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হয়।" নিমতলা ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য দোতলা গৃহ তৈরী করে দেন বাবু গিরীশচন্দ্রবসু।

শোভাবাজারের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর কুমারটুলিতে একটি শ্মশান নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই শোভাবাজারেরই রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর সাহেবদের পুরানো সমাধিস্থল ও সেন্ট জন গীর্জার জন্য জমিদান করেন। হাটখোলার দত্ত পরিবারের মদন মোহন দত্ত গয়ায় প্রেতশিলা পর্বতের চূড়া পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ করে দেন যাতে পিণ্ডদাতাগণ পিণ্ড দিতে গিয়ে পড়ে না যান। মহারানী স্বর্ণময়ী ছিলেন দানশীলা। যদি কেউ পিতা মাতার শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চেয়ে তাঁর দ্বারস্থ হতেন, তিনি খালি হাতে ফিরতেন না।

সেকালের বাবুদের শেষকৃত্যের পছন্দসই বা বাঁধাধরা ঘাট ছিল। অনেক পছন্দের গঙ্গাযাত্রী নিবাসে শেষ কটা দিন কাটিয়ে স্বর্গবাসী হতেন। অনেকের গঙ্গাতীরে নিজস্ব বাসাবাটী থাকত--- সেখানেই শেষ দিনগুলো কাটাতেন। কেউ আবার গৃহে মারা গেলেও তাঁর পূর্বকৃত পছন্দের ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হত। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নিমতলা ঘাটে শবদাহ চালু হলেও পাথুরিয়া ঘাটার রাজ্য সুখময় রায় বাহাদুরের স্ত্রী বাংলা ১২৩৬ সনের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দুপুরে দুই প্রহরের সময় পরলোক গমন করেন। সমাচার দর্পণ লিখছে--- "তাঁহার দুই পুত্র শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নৃসিংহ চন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাণীর শব লইয়া নৌকা যোগে কাশীপুরে তাঁহারদিগের নিজঘাটে জাহবীর তটে কাষ্ঠে ও ঘৃত ধুনাদি দ্বারা দাহ করিয়াছেন....।"

কান্দীর রাজবংশের নানান অনুষ্ঠান আমদের চমকে দেয়। দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ কান্দীতে তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ থেকে শুধু নয়, বর্ধমান, পাটুলী, যশোর থেকেও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিষ্য - সামন্ত নিয়ে সেই শ্রাদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এসেছিলেন নাটোরের রাজা। তবে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। কারণ তিনি কায়েতের বাড়ির নেমন্তন্নে যেতেন না। অথচ দেওয়ানজীকে উপেক্ষা করা যায় না তাই তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রকে পাঠালেন। শিবচন্দ্র গিয়ে দেখলেন এলাহি কাণ্ড, রাজা, ব্রাহ্মণ, ভিখারীতে লোকারণ্য। এক সপ্তাহ আগে থেকেই খাওয়া দাওয়া দান ধ্যান চলছে। সব কিছু দেখে তিনি পুলকিত হয়েশ্রাদ্ধের সুখ্যাতি করে বলেন--- "এ যে সাক্ষাৎ দক্ষযজ্ঞ"। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দ জবাব দিলেন--- "সে কি, সে যজ্ঞেযে শিব ছিল না, এখানে সাক্ষাৎ শিবচন্দ্র উপস্থিত।" এই গঙ্গা গোবিন্দের ভাইপো দেওয়ান বিজয় গোবিন্দ সিংহ এক ঐতিহাসিক পিণ্ড দানের উদযোগ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ২৮টি বাজরা, ভাউলে, ও পিনিসে পরিবারের লোক, কুলগু, পুরোহিত, পণ্ডিত, বৈষ্ণব আত্মীয় স্বজন ও এস্টেটের কর্মচারী সব মিলিয়ে ৮০০ শতাধিক লোককে নিয়ে গয়ার পথে যাত্রা করেন। ১২২৯ বঙ্গাব্দের ১৭ বৈশাখ পাটনা হয়ে গয়ায় পৌঁছান। এখানে শুধু দেওয়ান সাহেব নয় সকলের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করেন এবং ব্যয়ভার নিজেই বহন করেন।

শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রবর্তক রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পলাশী যুদ্ধের পর তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ৭ লাখ টাকা ব্যয়

করেছিলেন বলে মার্শম্যান তাঁর History of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যদিচ মহারাজের জীবন চরিত থেকে জানা যায় তিনি উক্ত শ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। রানী ভবানীর জীবন চরিত থেকে জানা যায় --- তাঁর স্বামী মহারাজ রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করাহয়েছিল। সিমলার বাবু রামদুলাল দে (রাম দুলাল সরকার) ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে বেলা আড়াইটা প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্বক পরলোক গত হইয়াছেন। তাঁর শ্রাদ্ধ বেশ ধুমধামের সঙ্গে হয়। খরচহয়েছিল আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা। আর ব্রাহ্মধর্মের নেতা রাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল বলে জানা যায়।

সেকালে হিন্দুরা মনে করত কাঙালী ভোজন, উপযুক্ত দান ধ্যান ও দরিদ্রের দুঃখ মোচন না করলে মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতি হয় না তাই তার মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ করতেন। অবশ্য সেকালে কাঙালী ভোজন এবং কাঙালী বিদায় নিয়ে কম সমস্যা ছিল না। কেউ যদি একাজে অসমর্থ হতেন তবে কাঙালীরা নগর বাজারের সমস্ত মালপত্র লুটপাট করত। একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে---"বাবু গোপাল কৃষ্ণ মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কাঙ্গালী বিদায়ে অক্ষম হওয়াতে কাঙ্গালিরা আহারাভাবে নগর বাজার সকল লুট করিয়াছিল।" (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র /বিনয় ঘোষ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯)। এই ঘটনার জেরে কলকাতার তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির বাবুগণের পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধের আগাম অনুমতি নেবার বিধান দেন। কলুটোলার বাবু মতিলাল শীল ১৮৫৪ সালের ২০শে মে পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্রেরা পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন স্থির করবেন। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট জানায় রবাহুত - অনাহূত কাঙালী বিদায়ে ত্রুটি হলে তারা নগরবাসীদের যদি কোন ক্ষতি করে, সেই ক্ষতি পুরণের জন্য অগ্রিম এক লক্ষ টাকা জমা রাখতে হবে। শুধু কি তাই, কোনো বাবুর শ্রাদ্ধে একাধিক পুত্রের মধ্যে কেউ হয়তো শ্রাদ্ধের খরচ দিলেন বাকীরা দিলেন না, তখন সেই অর্থ আদায়ের জন্য সুপ্রিম কোর্টে খরচবহনকারী ভাইয়েরা মামলা দায়ের করতেন।

বড় বাজারের ধার্মিকাগ্রগণ্য বাবু নিমাইচাঁদ মল্লিক (নিমাইচরণ) ৭১ বছর বয়সে তিন রাত্রি গঙ্গা তীরে বসবাসের পর ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর শনিবার পরলোক গমন করেন। ধুমধাম সহকারে তাঁর শ্রাদ্ধ হয়। গরীব, কাঙালী সেই শ্রাদ্ধে যে বিদায় পেয়েছিলেন তার তুলনা নেই। ভোলানাথ চন্দ্র National Magazine-এ জানুয়ারী ১৮৯৭ সখ্যায় ও বিষয়ে লেখেন--- Each of the eight sons got up a silver Dan Sagar. They also distributed eight lacs of rupees to the poor. One Brahman who had a hand in the distribution coolly appropriated a cart – load of silver to himself this was the Sradh that gave currency to the Saying chotta and Burra kangali Bidaya. It arose thus: There was a house with a large compound in the north – eastern quarter of the town. Though payment was going on from morning to dewy eve the kangalis showed no diminition in number. Coming to know that they were being privately let in again through a back door, proper guard was taken and a de novo payment was made. A few surplus bags remained after distribution, and their contents were scattered broadcast on the compound for the Burra Kangalis. নিমাইচরণ মল্লিকের স্ত্রীর শ্রাদ্ধও বিরাট ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 'কলিকাতাস্থ শোভাবাজার নিবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবনচরিত '-এ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধের বিবরণে চরিতকার লেখেন--- "এই সংবাদ প্রচার হইতে না হইতে ভাট, ফকির, কাঙ্গালী এবং অপরাপর অর্থ প্রয়াসী লোক পঙ্গপালের মত ক্রমাগত তাঁহার সদনে আসিতে লাগিল। শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইবার পূর্বে মহানগরী ১৮৬৬ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের ন্যায় কাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ হইল। ... নবকৃষ্ণ এই সকল কাঙ্গালীদের জন্য সকল পর্ণ কুটীর প্রস্তুত এবং খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা পর্যাপ্ত হইল না, ক্রমে বাজারের তন্ডুল, ফলমুল, তরকারি ফুরাইয়া গেল,.... এমন সময়ে নাগরিক এবং উপনগরস্থ ভদ্রলোকেরা স্ব স্ব ভবনে তাহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিতহইল--- অসংখ্য দর্শকবৃন্দ সভার শোভা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। একটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড কাষ্ঠফলক দ্বারাপরিবেষ্টিত, উপরে চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান, প্রবেশদ্বারে সৈনিক পুরষেরা প্রহরী, প্রাঙ্গণ মধ্যে বিপ্র এবং শূদ্রদিগের বসিবারপৃথক পৃথক আসন, একদিকে গায়কেরা হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছে, অপরদিকে বারানসী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিতণ্ডায় কোলাহল করিতেছেন, সম্মুখে দ্বাত্রিংশটী কাঞ্চন এবং রজত ষোড়শ, তৈজসগুলি অনতিতুঙ্গ পর্বত শ্রেণীর ন্যায় চন্দ্রাতপকে স্পর্শ করিতেছে। শালবনাতপ্রভৃতির স্তূপ দর্শনে দর্শকদিগের মনে হইল বুঝি বড় বাজারের দোকান সকল শূণ্য হইয়াছে। গজ, অশ্ব, সবৎস ধেনু, শিবিকা, শয্যা, ছত্র,

পাদুকা, আসন প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সভারঅনতিদূরে ভাণ্ডার মহলে দধি, দুগ্ধ, তৈল প্রভৃতি তরল দ্রব্যের হ্রদ কাটান হইয়াছে। মিষ্টান্ন এবং পঞ্চাশের স্তূপ দেখিলে এক একটী দেউল বলিয়া ভ্রম হয়, বহু সংখ্যক হালুই কর ব্রাহ্মন এবং মোদক অনবরত মিঠাই সন্দেশাদি প্রস্তুত করিতেছে , এবং তন্ডুল, দ্বিদল, ময়দা প্রভৃতি অ াড়তের ন্যায় রাশীকৃত ঢালা হইয়াছে।''

বলা বাহুল্য এই বিরাট শ্রাদ্ধটি যাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তিনি হলেন বাবু নবকৃষ্ণের দেওয় ান গোকুল ঘোষাল মহাশয়।

এতো গেল শ্রাদ্ধের বিবরণ। শ্রাদ্ধ নিয়ে সেকালে দলাদলিও কম ছিল না। কখনো দুই বাবুর মধ্যে, কখনোদুই গোষ্ঠীর মধ্যে বা ব্রাহ্মণদের মধ্যে। টোল চতুষ্পাঠীর সম্মানীয় অধ্যপক মহাশয় সশিষ্য সম্প্রদায়কে হয়তো কোনো শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে না দিয়ে আটকে দিতেন এ বলে যে, অমুক বাবুর শ্রাদ্ধে যোগ দেওয়া যাবে না। কারণওই অনুষ্ঠানে ত্রুটি আছে। ত্রুটি নানাবিধ। যেমন বিদ্ধ গোষ্ঠীর যোগদান, কিংবা নিমন্ত্রণ যথোচিত হয়নি বা ব্রাহ্মণবিদায়ের অর্থ বা নগদ দক্ষিণা অতীব কম। এই ভাবে চাপ দিয়ে দু-রকমের স্বার্থ সিদ্ধি হত। এক সশিষ্য সম্প্রদায়কেবসে রাখা (আঁটে রাখা) যেত, দুই, ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক বিদায়ের নগদ দক্ষিণা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বেড়ে যেত। জানা যায় এই ভাবে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকদের বিদায় নগতে ১০১ টাকায় উঠেছিল। শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ষষ্ঠপুত্র মহারাজ কমল কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের শ্র াদ্ধেও দলাদলি হয়। বাগবাজারের 'বাবু' নন্দলাল বসুর দিনলিপিতে পাই--- ''১২ ডিসেম্বর ১৮ অগ্রহায়ণ।। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ ও বরদা চরণ মিত্র এসেছিলেন কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রাদ্ধে ব্যবস্থা করতে। দলাদলি। .....

১৯ ডিসেম্বর, ৫ পৌষ।।

আজ কমলকৃষ্ণের শ্রাদ্ধ সভা। বিকালে নীলমণি বাবু ও কামাক্ষা তর্কবাগীশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাছ থেকে এলেন। তাঁরা আমাকে জানান ভুবন বিদ্যারত্ন এবং নবদ্বীপের অন্যান্যরা কেউই (শ্রাদ্ধ) সভায় যাচ্ছেন না। তাঁরা ব্রাহ্মণ বিদায় নেবেন না।.....

২২ ডিসেম্বর ৬ পৌষ।।

ন্যায়রত্ন মহাশয়কে চিঠি লেখা হল একথা জানিয়ে যে কায়স্থকুল সংরক্ষণী সভা পণ্ডিতদের ৭০ টাকা দেবে। ন্যায়রত্ন মহ াশয় এসে আমাকে জানালেন এই বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলবেন না।.....

২৬ ফেব্রয়ারি ৩ ফাল্গুন।।

বিশেষ কিছু ঘটেনি কেবল কমলকৃষ্ণের শ্রাদ্ধে সভা কলকাতার পণ্ডিতদের অর্থ প্রদান করেছে।''*

কলকাতার বাবু সমাজে দেব আর দত্তের লড়াই সুবিদিত। রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সঙ্গে বাবু চুড়ামণি দত্তের মামলা হয়। এই মামলায় জয়লাভের সংবাদ মৃত্যুর পূর্বেই দত্তবাবু শুনেছিলেন। আসলে একপুষে ধনী নব ----------

---

---------- * আগ্রহী পাঠকেরা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ''বাবু বিবি এবং তাহারা' গ্রন্থে বাবু নন্দলাল বসুর দিনলিপি দেখতে পারেন। কৃষ্ণের আর্থিক উন্নতি দত্তরা সহ্য করতে পারছিলেন না। দত্তদের মোসাহেবরা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে 'নবা' বলে অপমানজনক মন্তব্য পর্যন্ত করতেন।। চূড়ামণি দত্ত পরলোক গত হয়েছেন। তাঁর শবদেহ শোভাযাত্রা সহকারে শোভাবাজার রাজবাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে। পরিষদবর্গরা ব্যঙ্গ করে ছড়া কেটে চলেছেন, ঢুলিরাও ঢোলে সেই বোল তুলেছে----

''যম জিনিতে যায় রে চুড়ো যম জিনিতে যায়,
জপ তপ কর কিন্তু মরতে জানলে হয়।
সবাইকে ফেলে চুড়ো যম জিনিতে যায়
নবা তুই দেখবি যদি আয়।''

অবশ্য এর ফল খুব একটা ভাল হয়নি। চুড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধে কলকাতার ব্রাহ্মণরা যাতে যোগ না দেয় সেজন্য ষড়যন্ত্র হয়। উপায়ন্তর না পেয়ে যাবতীয় দোষ চুড়ামণি দত্তের পুত্র কালিপ্রসাদ দত্তের ঘাড়ে চাপানো হয়। এ ছাড়া সন্তোষ র ায়কে কালিঘাটের মন্দির তৈরীর জন্য অর্থ দান করে সে যাত্রায় চূড়ামণির শ্রাদ্ধ পণ্ডের ষড়যন্ত্র ব্যর্থকরা হয়।

এবার ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি বাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গ। রামমোহনের পুত্র উকিল বাবু রমাপ্রসাদ রায় হিন্দু ধর্ম মতে মায়ের শ্রাদ্ধ করছেন। বরাদ্দ ১ লক্ষ টাকা। শহরের সমস্ত গোষ্ঠীকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। কাশী থেকে কর্ণাট পর্যন্ত আমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়েছে। হুতোম লিখছেন রমাপ্রসাদ বাবু "মার সপিণ্ডিকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ করবেন কার না কৌতূহল বাড়ে।"

হুতোম প্রদত্ত বিস্তৃত বিবরণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যাক। তিনি চ তুষ্পাঠী ওয়ালা ভট্টাচার্যদের লোভ লালসাকে যেমন ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি বাদ যায়নি ব্রাহ্ম ওয়ালারাও। সে প্রসঙ্গ থাক, এখন শ্রাদ্ধের পূর্ব দিনের বিবরণ, "আগামীকাল সপিণ্ডন। আজকাল সহরে দলপতিদের অনেকেই কুলপানা চক্করের দলে পড়েছেন, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা---- রমাপ্রসাদ বাবু" সহরের প্রধান উকীল, সাহেবসুবোদের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ তাহাতেও আরও কত কি হয়ে পড়বেন, সুতরাং দলস্থ পণ্ডিতদিগের পত্র ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ও *** প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো।"

দলপতিরা হুঙ্কার ছাড়লেন, এ শ্রাদ্ধে যাওয়া যাবে না। সেই মত নোটিশ পড়লো। অনেকে আগে ভাগে রমাপ্রসাদ বাবুকে পত্র লিখে জানিয়ে দিলেন যে আপনার দলের সঙ্গে 'আচার ব্যাভার চলিত নাই' ফলে যাওয়া সম্ভব হবে না। অনেকে দু'নৌকায় পা দিয়ে চললেন। ভট্টাচার্য্যিদের কড়া পাহারা, নজরদারি সত্ত্বেও অনেকে ডুবে জল খাবার ধান্দা শু করলেন। 'শ্রাদ্ধের দিন রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী লোকারণ্য হয়ে গেলো গাড়ী বারেন্ডা থেকে বাবুর্চি খানাপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধরলো, এমকি, শ্রীক্ষেত্রে রথ যাত্রার জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখতেও এত লোকারণ্য হয় না।'

---

* হাইকোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন। পরে এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম জজ হল। ২৪ পরগণায় জমিদারী ছিল।

আর সপিণ্ডনের দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন বাড়তে লাগলো। "এক দিকে রাজ ভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিশূরের গুণকীর্ত্তণ কত্তে লাগলো, একদিকে ভট্টাচার্যদের তর্ক লেগে গেল, দু-দশজন- ভেতর মুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন। দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাঁটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং মের কাচের গ্লাস ও ডিশেরা যে ভয়ে কাঁপতে লাগলো।"

সেকালে কলকাতার ব্রাহ্মণ ভোজনের সরস ও জীবন্ত চিত্র হুঁতোম তাঁর নকশায় এঁকেছেন---- "কলকেতার ব্রাহ্মণ ভোজন দেখতে বেশ - হুজুরেরা আঁতুরের মেয়েটিকেও বাড়ীতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না--- যার যে কটি ছেলে পুলে আছে ফলারের দিন বেরোবে। এক একজন ফলার মুখো বামুনকে ত্রিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে দেখলে হঠাৎ বোধ হয়, যেন গু মশাই পাঠশালা তুলে চলেছেন। কিন্তু বেরোবার সময় বোধ হয় এক একটা সর্দ্দার ধোপা, ---লুটি মণ্ডার মোটটি একটা গাধায় বইতে পারেনা। ব্রাহ্মণেরা সিকি, দুয়ানি ও আধুলি দক্ষিণা পেয়ে, বিদেয় হলেন, দই - মাখন এঁটো কলাপাতা, ভাঙ্গা খুরী ও আঁবের আঁটীর নীল গিরি হয়ে গেল।"

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ ভোজের বিবরণও আছে

"শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলীনেরা পর্য্যন্ত ই মাছের মুড়ো - মুণ্ডী পেলেন-- একএকটা আধ বুড়ো আফিমখোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবানো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগল। এক এক জনের পাত গো - ভাগাড়কে হারিয়ে দিল।"

সন্ধে নামতে না নামতেই কাঙালীদের ভিড় বাড়তে লাগলো। তাদের সঙ্গে দোকানদার ভারী, উড়ে বেয়ারা, রেয়ো ও গুলি খোরেবাও যোগ দিয়েছিল। উপায়ন্তন না পেয়ে সন্ধে সাতটার সময়ে বড় বড় উঠোনওয়ালা লোকেদের বাড়িতে তাদের পোরা হলো। শেষে সিকি, আধুলি দু'আনি পয়সা দিয়ে তাদের বিদায় করা হলো। হুতোম লিখছেন----- "প্রায় ত্রিশ হাজার কাঙালী জমেছিলো, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ভবতী কাঙ্গালীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরের বিস্তার বাড়ে।"

দুপুরে শু হয়ে রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত ভোজ সভা চলে। সব মিলিয়ে ১৫ দিন ধরে ধুমধাম সহকারে এই সপিণ্ডনের কর্ম

চলেছিল।

যে সব দলপতিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি তাঁরা ঘোট পাকাতে শু করেন। যেসব ভট্টাচায্যিরা খেয়ে দেয় বিদায় নিয়ে এসেছিলেন তারাও নিজ নিজ দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে, শালগ্রাম শিলার সামনে দিব্যি খেয়ে বললেন --- তারা শহরেই ছিলেন না, অনেকে আবার বললেন--- রমাপ্রসাদ বাবুকে তিনি চেনেনই না। কেউ কেউ ধরা পড়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। গোবর খেয়ে বিষ্ণু নাম স্মরণ করে ভু কামালেন।

সবশেষে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের প্রসঙ্গ। তিনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রমে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর তিনদিন আগে থেকে তিনি মারাত্মক সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন। মৃত্যুর দিন সকালে ওষুধও খাননি। তঁার বেয়াই তাকে ওষুধ খেতে বললেও তিনি খাননি। তিনি বলেছিলেন---'ঔষধ রোগ নিরাময় করে, মৃত্যুর পথ রোধ করতে পারেনা।" এরপর মালা জপ করা শেষ হলে ভৃত্য নবীনকে সামান্য দুধ দিতে বলেন।। দুধ পানের পর তাকে বলেন--- 'আজ আমি দেহত্যাগ করব। পুরোহিতকে ডেকে পাঠা।' শেষ পর্যন্ত পুরোহিত এলেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা ও বৃন্দাবনে বসবাসের সময়ে নিয়োজিত। এরপর দেব বাহাদুর নানা গ্রন্থ পাঠ করে শেষকৃত্য সম্পর্কে যেসব গূহ্য তথ্য পেয়েছিলেন তা ব্যক্ত করলেন। এসব তথ্য 'দি ফ্রাইডে রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ভৃত্য নবীনকে তাঁর শেষকৃত্য বিষয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা হলো "আমার মৃত্যুর পর, দেহের সৎকার কিভাবে করতে হবে তোকে আগেই বলেছি। আবার তোকে বলছি ভালভাবে শুনে নে। মৃত্যুর পর দেহটিকে ভালভাবে স্নান করাবি। তারপর সেটিকে নতুন ধুতি পরাবার পর, তাতে গন্ধমাল্য ও বিভিন্ন প্রকারের ফুল সাজিয়ে দিবি। তারপর দেহ নিয়ে যমুনা তীর পর্যন্ত শোকযাত্রা হবে, সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে যাবেন বৈষ্ণব সমাজ। ঘাটে দেহটিকে আবার স্নান করাবি, আবার পুরোহতকে শেষকৃত্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছি, এখনও বললাম, সেই মত প্রতিটি অনুষ্ঠান যেন সুচারূপে করা হয়। চিতা সাজাবি কেবল তুলসী ও চন্দন কাঠ দিয়ে, অন্য কোনরকম কাঠ যেন না দেওয়া হয়, দেখবি (উল্লেখ করা যায় যে তিনি নিজে এই উদ্দেশ্যে প্রচুর তুলসী কাঠ সংগ্রহ করেরেখেছিলেন) জীবিত অবস্থায় আমি যেভাবে শুই, ঠিক সেই ভাবে চিতায় আমার দেহ শোয়াবি চিতার চার কোণে চারটে বেশ উঁচু বাঁশ পুঁতে তাতে আমার মশারী টাঙিয়ে দিবি, কিন্তু তাতে চিতার আগুন যাতে ধরে যেতে না পারে সেই রকম উঁচুতে মশারিটা খাটাবি। তারপর আমার উপদেশ অনুযায়ী দাহকার্য হবে। দেহের একসের মাত্র যখন অবশিষ্ট থাকবে সেই সময় চিতা নিবিয়ে ফেলবি। না পোড়া এই দেহাবশেষটিকে তিনভাগে ভাগ করে, একভাগ কচ্ছপদের খাওয়াবি, এক অংশ যমুনার গভীর জলে বিসর্জন দিবি আর শেষ অংশটি বৃন্দাবনের মাটিতে সমাধি দিবি, কিন্তুসাবধান, সমাধির গর্ত যেন বেশ গভীর হয় যাতে কোন জন্তু জানোয়ার সেটা মাটি খুঁড়ে তুলতে না পারে। দাহকার্য শেষ হবার পর নিঃশব্দে বাসায় ফিরে আসবি, বাসায় যেন সেদিন কোন রান্না না হয়, খুব ক্ষিদে পেলে অন্য কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিবি। আমার মৃত্যুর দশদিন পর যমুনায় দশটি পিণ্ড দিয়ে বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদের ভাল ভাবে ভোজন করাবি, এইসব শেষ হলে তোরা দেশে ফিরতে পারিস।"

বাবু সমাজের এসব বিচিত্র কীর্তি উনবিংশ শতকের সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হতে পারে। এ রকম আরো বিবরণ আছে। যেমন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গ। তবে তা এক্ষণে বলার আবশ্যক দেখিনা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com